# স্মরণকথা

বাণী পাল ❑ গৌরী মিত্র

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

# ভূমিকা

আমাদের বাল্য, কৈশোরের কথা 'স্মরণকথা'য় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। যা দেখছি, যা পেয়েছি তা ভুলিনি কেন? কারণ সে সবই দাগ কেটেছিল আমাদের মনে। পুরনো অনেক সংস্কার, স্থাপত্য, শিল্প এখন হারিয়ে গেছে। কিছু টিকে আছে রদবদল ঘটিয়ে। অতীতে সব কিছুতেই কতটা শুদ্ধতা ছিল, কতটা সারল্য ছিল তা বলার প্রয়াস করেছি এই স্মৃতিচারণ পর্যায়ে। মানুষও ছিল তখন খোলামেলা প্রকৃতির। ছোটোরা তাদের পরিবার শুধু নয়, প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও শিখত অনেক মূল্যবোধ। গাছপালা, গোয়ালের গোরু-বাছুর, বাড়ির কাজের লোকজন, দরজায় এসে দাঁড়ানো ভিখারি — সবার সঙ্গে সংযোগের ফলে তৈরি হত ছোটোদের মনের জমি। 'স্মরণকথা' পড়ে অনেকেই খুঁজে পাবেন তাঁদের অতীত জীবনকে। তাঁদেরও বাল্যস্মৃতি জাগ্রত হবে।

# সূচিপত্র

## ❑ প্রথম পর্ব


১. আনন্দদায়িনী দেবী জগদ্ধাত্রী ❑ ১৩
২. নৃসিংহদেবতলা ❑ ১৫
৩. বারোদোলের রূপবদল ❑ ১৭
৪. ডেপুটিবাড়ি ❑ ১৯
৫. শিউলি-কথা ❑ ২১
৬. জেহাদন নবি মোল্লা ❑ ২৩
৭. টুকরো স্মৃতি ❑ ২৫
৮. ছোটো ছোটো দাগ ❑ ২৭
৯. নীরব ব্যথা ❑ ২৯


## ❑ দ্বিতীয় পর্ব


১. পুরোনো শীতের উষ্ণতা ❑ ৩৩
২. আয় ভগবতী আয় ❑ ৩৫
৩. স-মানে সুখ দ-মানে দুঃখ ❑ ৩৭
৪. সাতুই আষাঢ় অম্বুবাচী ❑ ৩৯
৫. ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্মৃতি ❑ ৪১
৬. পাড়ি জমানো রেলগাড়িতে ❑ ৪৩
৭. খোলা ছাত—খুশির হাওয়া ❑ ৪৫
৮. কদলী বিভ্রাট ❑ ৪৭
৯. স্মৃতির অববাহিকায় জলঙ্গী নদী ❑ ৪৯
১০. মাটির পুতুল, প্রাণের পুতুল ❑ ৫১
১১. সর্পস্মৃতি ❑ ৫৩
১২. কলের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ❑ ৫৫

# আনন্দদায়িনী দেবী জগদ্ধাত্রী

কৃষ্ণনগরের নাম শুনলেই মনে হয় সরপুরিয়া আর মাটির পুতুল। কিন্তু আরও আছে যা বর্তমানে সবকিছু ছাপিয়ে যাচ্ছে। সে হল শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা। এত ধূমধাম, প্রতিমার বৈচিত্র্য, পূজামণ্ডপের কারুকার্য, বিচিত্র আলোকসজ্জা আর এত আনন্দ — আর কোনো পূজাতেই হয় না। অনেক পূজা কৃষ্ণনগরে হয় কিন্তু জগদ্ধাত্রী পূজায় আলাদা আমেজ।

কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজা সম্বন্ধে নানারকম জনশ্রুতি আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে দেবীদর্শন করে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। কৃষ্ণনগর জগদ্ধাত্রীর আদি পীঠস্থান। প্রথমদিকে জগদ্ধাত্রী পারিবারিক পূজা ছিল। ক্রমে ক্রমে এ পূজা সার্বজনীন বারোয়ারি পূজায় রূপান্তরিত হয়। প্রায় প্রতিটি বারোয়ারির নিজস্ব পূজামণ্ডপ আছে। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি, গোলাপটি, উকিলপাড়া, হাতারপাড়া, চকের পাড়া, বালকেশ্বরী, তহবাজার, পাত্রবাজার, কালীনগর, রাধানগর আদি বারোয়ারি, ঘূর্ণি শিবতলা, ঘূর্ণি বারোয়ারিতলা, ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য পূজা হয়।

দেবী জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা যায়, দেবী কোথাও দ্বিভুজা কোথাও চতুর্ভুজা, কোথাও শান্তমূর্তি সিংহের পিঠে সমাসীনা, কোথাও দুই দিকে সিংহকে নিয়ে দণ্ডায়মানা। আবার কোথাও দেবী অসুরবিনাশিনী। দেবীর সাজসজ্জাও অনেকরকম। শোলার সাজ, মাটির সাজ, সলমা চুমকির কাজ করা। এ ছাড়া আছে স্বর্ণালঙ্কার। এদিক থেকে চাষাপাড়ার 'বুড়িমা' হলেন সবথেকে বেশি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা। ইনি অতি প্রাচীনা এবং জাগ্রতা। বুড়িমার পূজামণ্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে প্রশাসনকেও হিমসিম খেতে হয়।

দেবীর পূজা-পদ্ধতি— একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা হয়। কেবলমাত্র নুড়িপাড়ায় একটি পূজা হয়, যেটা চারদিন ধরে। দশমীর দিন একটি নতুন উৎসব হয় যার নাম ঘট বিসর্জন। প্রতিমা বিসর্জনের থেকে কোনো অংশে কম জাঁকজমকপূর্ণ নয়। বেলা ১২টা থেকে শুরু হয়। মহাসমারোহে ঘট ও সঙ্গে নানারকম ট্যাবলো, আর শতশত ছেলেমেয়েবউরা আবির ও সিঁদুরে রঙিন হয়ে উৎসবমুখর করে তোলে। আর থাকে অসংখ্য ঢাক ও নানারকম আধুনিক বাজনা। কৃষ্ণনগরের প্রধান সড়ক দিয়ে এই শোভাযাত্রা চলে। ঘট বিসর্জন শেষ হওয়ার কিছু পরে সন্ধ্যা থেকেই প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। প্রতিটি প্রতিমা বাজনা ও আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি পর্যন্ত যায় এবং ওখান থেকে ফিরে সোজা খেয়াঘাট। যাতায়াতের পথের দুধারের বাড়ি

ও পথ থাকে লোকে লোকারণ্য। কোথাও একটু ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে না। জগদ্ধাত্রী পূজার সময় কোনো বাড়ি নবাগত ছাড়া থাকে না। বহিরাগতের আগমনে কৃষ্ণনগরের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। হোটেলে স্থান পাওয়া যায় না। সবচেয়ে কষ্ট হয় বাড়ির মেয়েদের। ১২টার মধ্যে ঘট বিসর্জন দেখে আবার সন্ধ্যায় দেবী বিসর্জন। কাজেই এই সময়টার মধ্যে অতিথি অভ্যাগত ও বাড়ির লোকেদের খাওয়া ও তদারক সেরে তাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন আনন্দের সঙ্গেই।

পূজামণ্ডপগুলি কোনো একটি প্রসিদ্ধ মন্দির বা প্রতিষ্ঠানের আদলে হুবহু তৈরি হয়। প্রবেশপথ ও ভিতরে বিভিন্ন বিষয় ও কুটিরশিল্পের উপাদান নিয়ে সাজানো হয়। এর ওপর থাকে আলোকসজ্জা। অপূর্ব সুন্দর — না দেখলে অনুভব করা যায় না। মণ্ডপের পথ অনেকদূর পর্যন্ত আলোকসজ্জা থাকায় অনেক সময় দুই বারোয়ারির আলোকসজ্জা মিশে সারা পথটাই আলোকিত হয়ে ওঠে।

এত ভিড় সত্ত্বেও প্রশাসনের সুব্যবস্থায় প্রতিটি প্রতিমা বিসর্জন নির্দিষ্ট সময়ে হয়। শহরে কোনোরকম অসামাজিক কাজ বা মারামারি হয় না। বাইরে থেকেও অনেক পুলিশ আসে পরিবেশ ঠিক রাখতে। এই পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিটি ঠাকুর ধীরে ধীরে প্রধান সড়ক ধরে রাজবাড়ি এবং সেখান থেকে খেয়াঘাটে যান। সঙ্গে প্রচুর ছেলে উন্মত্তের মতো বাজনার তালে তালে নেচে চলে। মানুষ মনের আনন্দে ও শান্তিতে তাদের প্রিয় জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জন দর্শন করে। এই বিসর্জনে একটা বিশেষত্ব আছে। সব প্রতিমা বিসর্জনের পর 'বুড়িমা' বিসর্জন হয়। পুলিশি প্রহরায় দেবীর প্রচুর গহনা খোলা হয়। বুড়িমা হলেন সব প্রতিমার অগ্রজা। তাই কনিষ্ঠাদের রওনা করিয়ে দিয়ে রাজকীয়ভাবে ধীরে ধীরে তিনি রওনা দেন নদীগর্ভে। নদীতীরে সজল চোখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে শত শত নরনারী আগামী বছরে তাঁদের প্রিয় বুড়িমার আগমন কামনা নিয়ে।

# নৃসিংহদেবতলা

সকাল থেকেই পাশের বাড়ি সাজ-সাজ রব। আজ ওদের নাতির মুখে প্রসাদ দেওয়া হবে। গাড়ি এসে গেছে। বাড়ির সবাই চলেছেন নাতিকে নিয়ে নৃসিংহদেবতলা। সঙ্গে দুধ, গোবিন্দভোগ আতপ চাল ও পরমান্ন, অন্যান্য উপকরণ সহ। এখানে প্রায় সব শিশুর অন্নপ্রাশন হয় নৃসিংহদেবের প্রসাদী পরমান্ন মুখে দিয়ে। যাঁরা শিশুকে নিয়ে ঠাকুরতলায় যেতে পারেন না তাঁরা প্রসাদ বাড়িতে এনে অন্নপ্রাশন দেন। সন্তান কামনায়ও অনেকে এখানে মানসিক করেন।

কৃষ্ণনগর শহর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দক্ষিণ-পশ্চিমে কৃষ্ণনগর রোড স্টেশন পেরিয়ে দেপাড়ায় নৃসিংহদেবের মন্দির। খুব প্রাচীন জায়গা। রাস্তার পাশে একটা উঁচু জায়গায় এই মন্দির। কে বা কারা মন্দিরের দেবতার প্রতিষ্ঠাতা সেকথা অজানা। প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে এই জায়গা ছিল জঙ্গলে ভরা। জরাজীর্ণ মন্দিরে দেবতার আবাস। প্রায় চার ফুট উঁচু কষ্টিপাথরে খোদিত মূর্তি। চতুর্ভুজ নৃসিংহ অবতার কোলে হিরণ্যকশিপুকে সংহাররত আর পায়ের কাছে করজোড়ে ভক্ত প্রহ্লাদ। প্রাচীন মূর্তিটির কিছু কিছু অংশ ভাঙা। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, নৃসিংহদেব স্বয়ম্ভূ বা অনাদি। তাই অঙ্গহানি হলেও এই বিগ্রহের পূজা চিরদিন ধরে চলে আসছে। আগে পায়ে হেঁটে বা গোরুরগাড়ি করে ভক্তরা পূজা দিতে যেতেন কারণ তখন মাটির কাঁচা রাস্তা গোরুরগাড়ি ছাড়া অন্য যানবাহন চলাচলের অনুপযুক্ত ছিল। মন্দিরের পাশে গভীর একটা বিল ছিল। কালো জলে টইটম্বুর। জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে দিনের বেলাতেও যেতে গা ছমছম করত।

শোনা যায়, প্রায় ২০০ বছর বা তারও আগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা মহারাজ শিবচন্দ্র এ মন্দির সংস্কার করে মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিত্যপূজার জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। কালের করাল গ্রাসে সেই সংস্কৃত মন্দিরটিও জীর্ণ হয়। পরে কৃষ্ণনগরের ভক্ত তারাদাস গড়াই মন্দিরটি সংস্কার করেন ও তাঁর বংশধরেরা বড়ো একটি নাটমন্দির করে দেন। মায়াপুর ইসকন কর্তৃপক্ষও একটি নাটমন্দির করেন। এখন রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ায় এই মন্দিরের সামনে দিয়ে নবনির্মিত চৈতন্য সেতুর ওপর দিয়ে সবসময় বাস ও অন্যান্য গাড়ি চলাচল করে। ভক্তদের যাতায়াতের কোনো অসুবিধা নেই। তাছাড়া চারিদিকে দোকানপাট বসে গেছে। পূজার জন্য সবকিছুই ওখানে পাওয়া যায়। এমনকি মাটির হাঁড়ি, জ্বালানি কাঠও। বেলা ১০-৩০ নাগাদ মন্দিরে পুরোহিত আসেন। পূজা বসে বেলা ১২টায়। স্থানীয় বিষ্ণুপুরের

বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় পদবির পুরোহিত বংশানুক্রমে পালা করে পূজা করেন। প্রতিবছর বৈশাখ মাসে শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে উৎসব হয়। সেইসময় মন্দিরে বিশেষভাবে ভক্তরা পূজা দেন।

নৃসিংহদেবতলার আর একটি স্থানমাহাত্ম্য আছে। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পরিক্রমাকালে নৃসিংহদেবতলায় এসে নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করেন।

# বারোদোলের রূপবদল

সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পূজাপার্বণ আর উৎসব চলছেই, সেইসঙ্গে আছে মেলা। আগে ছিল নির্দিষ্ট কয়েকটি মেলা। কিন্তু এখন সেগুলি তো আছেই, তারসঙ্গে প্রতি উৎসবের সঙ্গেই মেলা বসে যায়। ধর্মীয় মেলা ছাড়াও মেলা আছে। যেমন— বইমেলা, সংহতি মেলা, নেতাজি মেলা, এক্সপো মেলা, বিজ্ঞানমেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব মেলার কথা না বলে শুধু নদিয়ার কথা বলতে গেলেও বলে শেষ করা যাবে না। তবে নদিয়ার অসংখ্য মেলার মধ্য থেকে কেবলমাত্র সদর শহর কৃষ্ণনগরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন বারোদোলের কথাই এখানে বলি। কৃষ্ণনগরের পূর্বনাম ছিল রেউই। পরে নদিয়ার কৃষ্ণভক্ত মহারাজ রুদ্র শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে রেউই-এর বদলে কৃষ্ণনগর নাম রাখেন। এই বংশের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে বারোদোলের সূত্রপাত হয়। সুবিশাল পরিখাবেষ্টিত এলাকায় রাজার বাসবাড়ি, প্রবেশ-তোরণ, বাজারচক, ঘাট বাঁধানো দিঘি, ঠাকুরবাড়ি, পূজামণ্ডপ, নাটমন্দির ছাড়াও বিশাল মাঠ। এই মাঠেই বসে বারোদোলের মেলা।

পূজামণ্ডপটি পঙ্খের কাজ করা নানারকম কারুকার্যে শ্রীমণ্ডিত। নাটমন্দিরের দক্ষিণে টানাবারান্দায় বারোটি মঞ্চ আছে। বারোটি মঞ্চে ১৩টি কৃষ্ণমূর্তি নদিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হতে এসে দোলমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজবাড়ির কুলদেবতা হলেন বড়োনারায়ণ। বিরহীর মদনগোপাল, শান্তিপুরের গড়ের গোপাল, তেহট্টের কৃষ্ণরায়, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ছাড়াও বলরাম, শ্রীগোপীমোহন, লক্ষ্মীকান্ত, ছোটো নারায়ণ, ব্রহ্মণ্যদেব, নদিয়া গোপাল, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দদেব বিভিন্ন স্থান হতে আসেন। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বারোদোলে আসেন, উৎসবশেষে রাজবাড়ির ঠাকুর মন্দিরে অতিথি হয়ে সেবা নেন রথযাত্রা পর্যন্ত। কৃষ্ণনগরের রথতলার রথে শ্রীগোপীনাথ অধিষ্ঠিত হন এবং পুনর্যাত্রা সেরে অগ্রদ্বীপে ফিরে যান।

চৈত্রমাসে পূর্ণিমার শুক্লা একাদশী তিথি হতে তিনদিন চলে সাড়ম্বরে বারোদোল পূজা। ভক্তরা স্নান সেরে যে যার পূজা নিয়ে বিশেষ করে নিজেদের গাছের ফল নিয়ে ঠাকুরকে নিবেদন করেন। তিন দিনের পূজারও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমদিন ঠাকুর রাজবেশে সজ্জিত হন। বেনারসী পরে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হয়ে চারিদিক আলো হয়ে দেবতা যেন উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন। দ্বিতীয় দিন ঠাকুরের ফুলবেশ। পুষ্পহার ফুলের মুকুট, হাতে গলায় মালা—অপূর্ব সে মূর্তি! সারা দোলমঞ্চ ছাড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণ ফুলের সুগন্ধে যেন ম ম করছে। তৃতীয় দিন ঠাকুর তাঁর রত্নালঙ্কার, পুষ্পাভরণ ছেড়ে একটা ধুতি পরে গামছা বেঁধে হাতের মোহনবাঁশি ফেলে পাঁচনবাড়ি তুলে নিয়ে রাখালবেশে এসেছেন। তিনদিন পর মঞ্চ ত্যাগ করে ঠাকুরবাড়ি ওঠেন। পরে নিজ নিজ স্থানে চলে